ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের বৈশিষ্ট্য: ব্যাপকতা

সাইয়্যেদ কুতুব

সবকিছুই আমি স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত করে রেখেছি।

(সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ১২)

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো —এর ব্যাপকতা। মহান আল্লাহ ব্যাপকতাকে এই ওয়ার্ল্ডভিউয়ের একটা বৈশিষ্ট্য বানিয়েছেন। মানুষের অস্তিত্ব স্থান ও কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ। এক নির্দিষ্ট সময়ে সে অস্তিত্বে আসে, তারপর কিছু সময় পৃথিবীতে কাটিয়ে ফিরে যায়। তার অবস্থান ও চলাফেরা স্থান ও কালের সীমানার ভেতর। এই সীমাবদ্ধতা শুধু ব্যক্তির নয়, বরং প্রজন্ম, সমাজ এমনকি পুরো মানবজাতির জন্যও তা প্রযোজ্য। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির দিক থেকেও মানুষ সীমাবদ্ধ। মানুষের জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার সীমা নিয়ন্ত্রিত হয় তার আয়ু আর আবাসস্থল দ্বারা। ইন্দ্রিয়সমূহ, বুদ্ধিমত্তা ও মানসিক সক্ষমতা মানুষের জ্ঞানের সীমানা নিয়ন্ত্রণ করে। আবেগ, কামনাবাসনা ও খেয়ালখুশি দ্বারাও মানুষ নিয়ন্ত্রিত হয়।

মানুষের বানানো আকীদা, ধ্যানধারণা কিংবা জীবনব্যবস্থার মধ্যে ব্যাপকতা থাকে না। মানবরচিত ওয়ার্ল্ডভিউতে এ দুর্বলতা থেকে যায় সবসময়। মানুষের বানানো ওয়ার্ল্ডভিউ কোনো নির্দিষ্ট সময়, স্থান ও প্রেক্ষাপটের জন্য উপযুক্ত হতে পারে, কিন্তু অন্য অনেক ক্ষেত্রে তা অনুপযুক্ত। সমস্যা সমাধানের সময় সম্ভাব্য সব দিক থেকে মানুষ সেটার মূল্যায়ন করতে পারে না। প্রস্তাবিত সমাধানের সব পরিণতি, সব পার্শ্ব ও পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া ধরা পড়ে না আমাদের চোখে। আমরা নজর দিই বাস্তবতার এক সীমিত অংশের দিকে। কিন্তু প্রত্যেক সমস্যা আর এর সমাধান স্থান ও কাল জুড়ে ব্যাপ্ত। এর সম্পর্ক অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাথে। মানবীয় সীমাবদ্ধতার কারণে এই সম্পূর্ণতাকে আমরা দেখতে পাই না, মূল্যায়ন করতে পারি না। বিশাল সমুদ্রের অল্প কিছু বিন্দুতেই আমরা মনোযোগ দিতে পারি।

মানুষের বানানো দর্শন বা জীবনব্যবস্থার মধ্যে তাই সত্যিকার অর্থে ব্যাপকতার বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না। বেশি থেকে বেশি হলে; মানবরচিত ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট সময়ে জীবনের কোনো এক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। তবে এতে সবসময় কোনো না কোনো ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে যাবে। এধরনের দর্শন এবং জীবনব্যবস্থা অবধারিতভাবে জন্ম দেবে নানা সমস্যার। বারবার তাতে আনতে হবে সংশোধন ও পরিবর্তন। মানবরচিত দর্শনের ওপর ভিত্তি করে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সমাজকে সবসময় মুখোমুখি হতে হবে সাংঘর্ষিকতা, অসংলগ্নতা আর 'দ্বান্দ্বিকতার'। ইউরোপের ইতিহাস এই বাস্তবতার করুণ উদাহরণ।

কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ যখন আকীদা নির্দিষ্ট করে দেন এবং সেই আকীদা থেকেই যখন জীবনব্যবস্থা প্রবাহিত হয়, তখন ব্যাপারটা

বদলে যায়। মানবরচিত দর্শন এবং জীবনব্যবস্থার সব ধরনের ত্রুটি, পরস্পর বিরোধিতা এবং বিভ্রান্তি থেকে সেই জীবনব্যবস্থা হয় মুক্ত। একই কারণে ব্যাপকতা হয় সেই জীবনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। আমরা ইসলামের শিক্ষার এমন কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি, যা থেকে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের ভেতরে থাকা সহজাত ব্যাপকতার বৈশিষ্ট্যকে বোঝা সহজ হবে।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের ব্যাপকতা

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের ব্যাপকতার প্রথম এবং সবচেয়ে সোজাসাপ্টা উদাহরণ হলো —অস্তিত্বের সম্পূর্ণতার ব্যাখ্যা। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ অস্তিত্বের সম্পূর্ণতার ব্যাখ্যা দেয়। মহাবিশ্বের সূচনা, কার্যকরণ, গতিশীলতা, পরিবর্তন, বিকাশ এবং ব্যবস্থাপনাকে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ ব্যাখ্যা করে মহান আল্লাহর মাধ্যমে। এ সবকিছু চিরন্তন, মহান, সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। জীব ও জড়-; এই মহাবিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তিনি। মহাবিশ্বের প্রতিটি গতি-, পরিবর্তন ও বিকাশ ঘটে তাঁরই ইচ্ছা এবং ঠিক করে দেওয়া মাত্রা অনুযায়ী। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি এক, অদ্বিতীয়, অনন্য। মহান আল্লাহ হলেন সেই মহান সত্তা, যিনি মহাবিশ্বের উৎপত্তি ঘটিয়েছেন। তিনি এবং শুধু তিনিই নতুন করে কোনোকিছুকে অস্তিত্বে আনেন।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের প্রথম ও সবচেয়ে মৌলিক উপাদান হলো মহান আল্লাহর একত্ববাদের শিক্ষা বা তাওহীদ। কুরআনের অনেক আয়াতে এই মহা পবিত্র সত্যের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা এসেছে। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় আমরা এখন যাব না, শেষ অধ্যায়ে এ নিয়ে আলোচনা করা হবে। এখানে আমরা শুধু এই ধারণার তাৎপর্য, গুরুত্ব এবং মূল্য নিয়ে অল্প কিছু কথা বলব।

মহাবিশ্বের উৎপত্তি, শৃঙ্খলা, পরিবর্তন ও বিকাশের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়ার পাশাপাশি, জড় প্রকৃতির মাঝে প্রাণের কীভাবে উৎপত্তি হলো, সে প্রশ্নেরও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা তাওহীদের ধারণা আমাদেরকে দেয়। নিঃসন্দেহে প্রাণ আর জড়বস্তু একেবারে আলাদা। প্রাণের পেছনে থাকে ইচ্ছা, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য। অস্তিত্ব আর অনস্তিত্বের মাঝে যেমন অনতিক্রম্য দূরত্ব, প্রায় তেমনই বিশাল দূরত্ব বস্তু আর প্রাণের মধ্যে।

মানুষের মধ্যে মহাবিশ্বের রহস্যকে বোঝার তাড়না কাজ করে। মহাবিশ্বের মধ্যে থাকা নিয়মের ভারসাম্য আর বিস্ময়কর নকশা তাকে বলে দেয়—-হঠাৎ করে এলোমেলো কোনো দুর্ঘটনায় মহাবিশ্ব তৈরি হয়নি। কারণ ঘটনা বা দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেও আগে কিছু নিয়মের প্রয়োজন হয়। সেই নিয়মগুলো কোথা থেকে এল?[1]

হিসেব করলে দেখা যাবে—-আমাদের চারপাশে থাকা ভারসাম্যপূর্ণ, সুপরিকল্পিত নিয়মের যে কাঠামো, তা এলোমেলোভাবে তৈরি হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। সাথে যদি মহাবিশ্বের মাঝে থাকা নিয়মানুবর্তীতার সম্ভাবনার হিসাবটা যুক্ত করা হয়, তাহলে সংখ্যাটা দাঁড়ায় শূন্যের কাছাকাছি। মহাবিশ্ব এবং এর মাঝে থাকা সূক্ষ্ম ভারসাম্য আর সুপরিকল্পিত নকশা কাকতালীয়ভাবে, দৈবক্রমে গড়ে উঠেছে;- এ কথা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।[2]

প্রাণের অস্তিত্ব এমন কিছু গভীর প্রশ্নের জন্ম দেয়, সত্যের সন্ধানে ছুটে চলা মানুষকে যেগুলোর উত্তর খুঁজে বের করতেই হয়। জড়বস্তু থেকে কীভাবে প্রাণের উদ্ভব হলো? জড়বস্তুর মধ্যে গতিশীলতা তৈরি হলো কীভাবে? কীভাবে মহাজাগতিক বস্তুগুলো বিস্ময়কর সূক্ষ্মতার সাথে চালিত হয়? কীভাবে বজায় থাকে অসংখ্য সমীকরণ আর চলকের মধ্যে সামঞ্জস্য? সূক্ষ্ম ভারসাম্য

বিদ্যমান, মহাকাশ থেকে শুরু করে অণু-পরমাণুর পর্যায়ে পর্যন্ত। এই ভারসাম্য ছাড়া জীবনের উৎপত্তি এবং টিকে থাকা সম্ভব হতো না। এই ভারসাম্য কীভাবে তৈরি হলো? প্রাণ কীভাবে এত দিন টিকে থাকল?

কেবল ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউই এই প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে। মহাবিশ্বের উৎপত্তি, মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটে, জড়বস্তু থেকে জীবের উৎপত্তি এবং জীবের টিকে থাকা ও সমৃদ্ধি—সবকিছুর ব্যাখ্যা দিতে পারে ইসলাম। কোনো প্রশ্ন থেকে আমাদের পালিয়ে বেড়াতে হয় না। লুকাতে হয় না কোনো মতবাদ বা অন্ধ দাবির পেছনে। প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে 'প্রকৃতি' নামের অসংজ্ঞায়িত কোনো ধারণার দ্বারস্থও হতে হয় না আমাদের।

নিশ্চয়ই অনস্তিত্ব এবং অস্তিত্বের মধ্যে থাকা ব্যাপক দূরত্ব অতিক্রম করা মানবীয় বুদ্ধিমত্তার পক্ষে সম্ভব নয়। কেন মহাবিশ্বের অস্তিত্ব আছে? কেন বস্তুগত দুনিয়ার (physical world) অস্তিত্ব আছে?—এ প্রশ্নগুলোর একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হলো : মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে একজন স্রষ্টার ইচ্ছা অনুযায়ী। তিনি বলেছেন, কুন—হও, ফাইয়াকূন—আর তা হয়ে গেছে। আর কোনোভাবে এই বিস্তৃত দূরত্ব পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব নয় সৃষ্টির ব্যাখ্যা দেওয়া। সৃষ্টির একমাত্র কারণ স্রষ্টার ইচ্ছা। এ সত্যকে যে স্বীকার করবে না, মহাবিশ্বের অস্তিত্বে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সে বিহ্বল হয়ে যাবে। ইতিহাস জুড়ে দার্শনিকদের প্রচার করা বিশৃঙ্খল, নৈরাজ্যপূর্ণ অনুমান আর জল্পনাকল্পনা এই বাস্তবতার প্রমাণ।

অস্তিত্ব আর অনস্তিত্বের মতো আরেক অনতিক্রম্য দূরত্ব হলো জড়বস্তুর সাথে জীবনের দূরত্ব। প্রাণের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসেবে স্রষ্টাকে গ্রহণ না করলে, এ দূরত্বও অতিক্রম করা সম্ভব নয়। আর এই স্রষ্টা হলেন এমন এক সত্তা, যিনি যা ইচ্ছে তাই করেন। সৃষ্টি করেন নিজের ইচ্ছেমতো।

> মূসা বলল, 'আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি সকল (সৃষ্ট) বস্তুকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন।' (সূরা ত্বহা, ২০ : ৫০)

এই ব্যাখ্যা মানবীয় বুদ্ধিমত্তা এবং মানবপ্রকৃতির কাছে সন্তোষজনক। মৃতবস্তু থেকে জীবনের উৎপত্তি হয়েছে; এই বিশ্বাস হাস্যকর। যার মাঝে জীবনের অস্তিত্ব নেই, সে কীভাবে জীবনের উৎস হতে পারে? যা বস্তুর মাঝে অনুপস্থিত, তা কখনোই বস্তু থেকে আসতে পারে না। 'প্রাণ বস্তুরই একটা বৈশিষ্ট্য, কিন্তু তা বস্তুর মধ্যে লুকোনো ছিল'; একথাও বলা সম্ভব নয়। সহস্র বছর ধরে যে প্রাণ বস্তুর মধ্যে লুকিয়ে ছিল, হঠাৎ একদিন বাহ্যিক কোনো শক্তি, উদ্দেশ্য কিংবা অর্থ ছাড়াই সে নিজেকে প্রকাশ করল—তা কীভাবে সম্ভব? কাজেই প্রাণের উৎপত্তি জড়বস্তু ছাড়া অন্য কোনো উৎস থেকে হয়েছে, এ কথা এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

ইসলাম আমাদের শেখায়, মহাবিশ্বের সবকিছুই আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। তাঁর ইচ্ছা, ক্ষমতা, ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা সামগ্রিক, সর্বব্যাপী। এ ব্যাপারে কুরআনের কিছু আয়াত দিকে তাকানো যাক :

> নিশ্চয় আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে। (সূরা ক্বামার, ৫৪ : ৪৯)

> তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা নির্ধারণ করেছেন যথাযথ অনুপাতে। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ২)

প্রতিটি জিনিস তাঁর কাছে আছে পরিমাণমতো। (সূরা রা’দ, ১৩ : ৮)

মূসা বলল, ‘আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি সকল (সৃষ্ট) বস্তুকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন।’ (সূরা ত্বহা, ২০ : ৫০)

আমি কোনোকিছুর ইচ্ছে করলে সে বিষয়ে আমার কথা তো শুধু এই যে, আমি বলি, ‘হও’; ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ৪০)

নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি আরশের ওপর উঠেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। প্রত্যেকটি একে অপরকে দ্রুত অনুসরণ করে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজি, যা তাঁর নির্দেশে নিয়োজিত। জেনে রেখো!- সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও (চলবে) তাঁর।- বরকতময় আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতিপালক। (সূরা আ’রাফ ৭ : ৫৪)

আর রাত তাদের জন্য একটি নিদর্শন; আমি তা থেকে দিনকে সরিয়ে নিই, ফলে তখনই তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট পথে, এটা মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের সুনিরূপিত নির্ধারণ। আর চাঁদের জন্য নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মানযিল; অবশেষে সেটা শুষ্ক বাঁকা, পুরনো খেজুর শাখার আকারে ফিরে যায়। সূর্যের জন্য সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া, আর রাতের জন্য সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা, আর প্রত্যেকেই কক্ষ পথে ভেসে বেড়ায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৩৭-৪০)

আর আল্লাহ প্রত্যেক জীবকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের কোনোটি পেটে ভর দিয়ে চলে, কোনোটি চলে দুপায়ের ওপর, আবার কোনোটি চার পায়ের ওপর চলে। আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। (সূরা নূর, ২৪ : ৪৫)

...আর আমি সকল প্রাণবান জিনিসকে সৃষ্টি করলাম পানি থেকে... (সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৩০)

আল্লাহই হচ্ছেন শস্যদানা ও বীজ বিদীর্ণকারী, তিনি মৃত থেকে জীবন্তকে বের করেন এবং জীবন্ত থেকে মৃতকে। তিনিই আল্লাহ, সুতরাং (সৎপথ থেকে) কোথায় তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে? তিনি ঊষার উন্মেষ ঘটান, তিনি বানিয়েছেন রাতকে প্রশান্তি এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সময় নিরূপক। এটা পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহর নির্ধারণ। আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য তারকারাজি, যাতে তোমরা এ দ্বারা পথপ্রাপ্ত হও স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে। আমি আমার নিদর্শনগুলোকে জ্ঞানীদের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি। তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন অতঃপর তা দ্বারা আমি সকল প্রকার উদ্ভিদ উদ্‌গত করি, অতঃপর তা থেকে সবুজ পাতা উদ্‌গত করি, অতঃপর তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপন্ন করি, খেজুর গাছের মোচা থেকে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করি, আঙুরের বাগান সৃষ্টি করি, আর সৃষ্টি করি যাইতুন ও ডালিম, সেগুলো একই রকম এবং বিভিন্ন রকমও। লক্ষ করো, তার ফলের প্রতি, যখন গাছে ফল আসে আর ফল পাকে। এসবের ভেতরে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন আছে। (সূরা আনআম, ৬ : ৯৫-৯৯)

যেসব ঘটনার প্রত্যক্ষ কারণ দেখা যায়, সেগুলোর পেছনেও চূড়ান্ত কারণ হলো মহান আল্লাহর ক্বাদর, মহান আল্লাহর ইচ্ছা :

> আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তবে কেন তোমরা সত্যকে বিশ্বাস করবে না? তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে? তা কি তোমরা সৃষ্টি করো, না আমিই তার স্রষ্টা? তোমাদের মধ্যে মৃত্যু আমিই নির্ধারণ করি এবং আমাকে অক্ষম করা যাবে না তোমাদের স্থানে তোমাদের বিকল্প আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতিতে সৃষ্টি করতে, যা তোমরা জানো না। আর অবশ্যই তোমরা অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, তবে তোমরা কেন উপদেশ গ্রহণ করো না?
>
> তোমরা যে বীজ বপন করো, সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা তা অঙ্কুরিত করো, না আমি অঙ্কুরিত করি? আমি চাইলে তা খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা পরিতাপ করতে থাকবে, (আর বলবে যে) ‘আমরা তো দায়গ্রস্ত হয়ে পড়লাম, বরং ‘আমরা হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়েছি।’
>
> তোমরা যে পানি পান করো, সে ব্যাপারে আমাকে বলো। বৃষ্টিভরা মেঘ থেকে তোমরা কি তা বর্ষণ করো, না আমি বৃষ্টি বর্ষণকারী? আমি ইচ্ছে করলে তাকে লবণাক্ত করে দিতে পারি, তাহলে কেন তোমরা শোকর আদায় করো না? তোমরা যে আগুন প্রজ্বলিত করো, সে ব্যাপারে আমাকে বলো, তোমরাই কি এর (লাকড়ির গাছ) উৎপাদন করো, না আমি করি? আমি তাকে (অর্থাৎ আগুনকে) করেছি স্মারক আর মরুর অধিবাসীদের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু। কাজেই (হে নবি!) আপনি আপনার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন। (সূরা ওয়াকিআ, ৫৬ : ৫৭-৭৪)
>
> সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করোনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর আপনি যখন নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন আপনি নিক্ষেপ করেননি বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন এবং এটা মুমিনদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তমরূপে পরীক্ষার (মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদার অসীন করার) জন্য; নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা আনফাল, ৮ : ১৭)

তাওহীদের ধারণা মানুষের চিন্তা ও মনে গভীর প্রশান্তি ও সন্তুষ্টি নিয়ে আসে। বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইতিহাসজুড়ে পৌত্তলিক এবং দার্শনিকরা ‘প্রকৃতি’, ‘পরম বুদ্ধিমত্তা’-সহ অনেক কাল্পনিক সত্তা আর পৌরাণিক দেবদেবীর ধারণা আবিষ্কার করেছে। তাওহীদের শিক্ষা এধরনের অর্থহীন জল্পনাকল্পনা আর অনুমানের পেছনে বুদ্ধি আর শক্তি অপচয় করা থেকে মানুষকে রক্ষা করে। তাওহীদ আমাদের শেখায় মহাবিশ্বে ক্রিয়াশীল সকল শক্তি, সকল কারণ, মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। এ বিশ্বাস ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে নৈতিকতার বোধ জাগ্রত করে। সৃষ্টিজগতের সুতোকে যুক্ত করে মহান আল্লাহর সাথে।

বাস্তবতার দুটি দিক আছে। একদিকে মহান আল্লাহ, তাঁর বৈশিষ্ট্য ও কাজের বাস্তবতা, অন্যদিকে মহান আল্লাহর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এবং সেগুলোর বাস্তবতা। ইসলামিক ওয়ার্ল্ডভিউ এই দুধরনের বাস্তবতার ব্যাপারেই আমাদের বিস্তারিতভাবে জানায়। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে নিঃসন্দেহে মহৎতর বাস্তবতা হলেন মহান আল্লাহ। সব সৃষ্টি তাঁর কাছ থেকেই আসে, সবকিছু তাঁরই মুখাপেক্ষী। মহাবিশ্ব, প্রাণিজগৎ, মানুষ—সবকিছু সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ এই সৃষ্টিগুলোর বাস্তবতা, উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে কথা বলে সামগ্রিকভাবে। মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক নিয়েও ইসলাম আলোচনা করে।

এই সবগুলো ধারণাকে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ এক সূত্রে গাঁথে সুসংহত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে। এমনভাবে সংযুক্ত করে সবকিছুকে উপস্থাপন করে, যা মানুষের অন্তর ও বুদ্ধিমত্তাকে আকৃষ্ট করে এবং মানুষকে এনে দেয় গভীর প্রশান্তি। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের ব্যাখ্যাগুলো মানুষ সহজাতভাবে স্ব-প্রমাণিত সত্য হিসেবে চিনতে পারে। এ শিক্ষা মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে গেঁথে যায় খুব সহজে।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ এই সত্যগুলোকে তুলে ধরে বিস্তারিত বর্ণনাসহ নিখুঁতভাবে। বাহ্যিক কোনো উৎস থেকে অতিরিক্ত কোনো আলোচনা যুক্ত করার প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ অন্য কোনো উৎস থেকে কোনো ধরনের সংযোজন মেনেও নিতে পারে না। ইসলাম অন্য সবকিছুর চেয়ে বিস্তৃত, ব্যাপক, নিখুঁত, তাৎপর্যপূর্ণ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কিন্তু এই বিশুদ্ধ ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ একসময় কলুষতা এবং বিকৃতির মুখোমুখি হলো। সর্বপ্রথম এই ব্যাপারটা ঘটল এমন এক দল লোকের হাতে, যারা ইতিহাসে পরিচিত 'ইসলামি দার্শনিক' নামে । এই লোকগুলো গ্রীক দার্শনিকদের; বিশেষ করে অ্যারিস্টটল, প্লোটিনাস এবং গ্রীক দর্শন প্রভাবিত খ্রিষ্টান ধর্মতাত্ত্বিকদের ধ্যানধারণা এবং পরিভাষাগুলো ধার করে সেগুলোকে ইসলামের ওপর চাপিয়ে দিলো।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ বিজাতীয় যেকোনো উপাদান প্রত্যাখ্যান করে, যদিও সে উপাদান নিছক একটা পরিভাষা হয়। প্রত্যেক পরিভাষার পেছনে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থাকে। সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে জন্ম নেওয়া অর্থ, তাৎপর্য এবং সম্পর্কগুলো ওই পরিভাষা নিজের ভেতরে বহন করে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আর ওই প্রেক্ষাপটের সাথে যুক্ত অর্থ ও ধ্যানধারণাকে পুরোপুরি মুছে ফেলে, সম্পূর্ণ নতুন অর্থে কোনো পরিভাষাকে প্রয়োগ করা যায় না। এটা অসম্ভব। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের নিজস্ব পরিভাষা আছে। এই পরিভাষাগুলো কুরআনের ভাষা, ইসলামের শিক্ষা এবং সেই শিক্ষার তাৎপর্যের সাথে যুক্ত। এই পরিভাষাগুলোর আছে নিজস্ব প্রকৃতি ও মেজাজ। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সূক্ষ্ম আমেজ, এর পূর্ণ অর্থ বোঝা এবং এর কদর করার জন্য তাকে তার নিজস্ব পরিভাষা অনুযায়ী উপস্থাপন করা জরুরি। বিষয়টি সূক্ষ্ম—অনুধাবন এবং উপস্থাপনা;- উভয় ক্ষেত্রেই।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের প্রাথমিক উদ্দেশ্য —মানুষকে তার রব সম্পর্কে জানানো। মানুষকে এ সত্য জানানো যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি থেকে একেবারেই আলাদা। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ মহাবিশ্ব এবং এর ভেতরের সবকিছুর সাথে মহান আল্লাহর সম্পর্কের ব্যাপারে মানুষকে জানায়। মানুষের মনে গেঁথে দেয় মহান আল্লাহর অস্তিত্বের বাস্তবতা। ঈমানের সাথে অন্তরকে এমনভাবে জুড়ে দেয়, যাতে অন্তর নিজের রবের ব্যাপারে বিস্মৃত না হয়। ঈমান অবিসংবাদিত সত্য নিয়ে মানবমনের সামনে হাজির হয়, আর তখন মানুষ উপলব্ধি করে—কে তার ওপর কর্তৃত্ব করে, কে সত্যিকারের মালিক।

> যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই। যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু। বিচার দিনের মালিক। (সূরা ফাতিহা, ১ : ২-৪)
>
> আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আকাশমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, তাঁরই। কে সেই ব্যক্তি, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করে?

তিনি লোকদের সমুদয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা জানেন। পক্ষান্তরে তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছে করেন, সেটুকু ছাড়া মানুষ তাঁর জ্ঞানের কোনোকিছুই আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়। তাঁর কুরসি আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে এবং এ দুয়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, মহান। (সূরা বাকারা, ২ : ২৫৫)

আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব সকলের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তিনি সত্যসহ আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, পূর্বে যা এসেছে তার সত্যতা প্রতিপন্নকারীরূপে। আর তিনি নাযিল করেছিলেন তাওরাত ও ইনজীল। ইতঃপূর্বে মানবজাতির পথ প্রদর্শনের জন্য; আর তিনি ফুরকান নাযিল করেছেন। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফরি করে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধগ্রহণকারী। নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের কোনো জিনিসই আল্লাহর নিকট গোপন থাকে না। তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই; (তিনি) প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ২-৬)

বলুন, ‘হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন; যাকে ইচ্ছা আপনি সম্মানিত করেন আর যাকে ইচ্ছা আপনি হীন করেন। কল্যাণ আপনারই হাতে। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আপনি রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে প্রবিষ্ট করান; আপনি মৃত থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান, আবার জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটান। আর যাকে চান বিনা হিসাবে রিযক দান করেন।’ (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ২৬-২৭)

বলুন, ‘আসমানসমূহ ও জমিনে যা আছে, তা কার?’ বলুন, ‘আল্লাহরই’, তিনি তাঁর নিজের ওপর দয়া করা লিখে নিয়েছেন। তিনি কিয়ামাত দিবসে তোমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা ঈমান আনবে না। আর রাত ও দিনে যা কিছু স্থিত হয়, তা তাঁরই এবং তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। বলুন, ‘আমি কি আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করব? তিনি আহার দেন, তাঁকে আহার দেওয়া হয় না।’ বলুন, ‘আমাকে আদেশ করা হয়েছে আমি যেন ইসলাম গ্রহণকারীদের প্রথম হই’, আর (আমাকে আরও আদেশ করা হয়েছে) আপনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।’

বলুন, ‘আমি যদি আমার রবের অবাধ্যতা করি, তবে নিশ্চয় আমি ভয় করি মহা দিবসের আযাবকে।’ সে দিন যাকে (শাস্তি থেকে) রক্ষা করা হবে, তাকে তো বড় অনুগ্রহ করা হবে। আর এটাই হবে সুস্পষ্ট সাফল্য। আল্লাহ তোমার কোনো ক্ষতি করতে চাইলে তিনি ছাড়া কেউ তা সরাতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ করতে চান, তবে তিনিই তো সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণকারী, তিনি প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবহিত।

বলুন, ‘কোন জিনিস সবচেয়ে বড় সাক্ষী?’ বলুন, ‘আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আর এ কুরআন আমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে আমি তার সাহায্যে তোমাদেরকে আর যাদের কাছে তা পৌঁছবে তাদেরকে সতর্ক করি। তোমারা কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহও আছে?’

বলুন, 'আমি সে সাক্ষ্য দিই না।' বলুন, 'তিনি তো একমাত্র প্রকৃত ইলাহ আর তোমরা যা শরীক করো, আমি নিশ্চয়ই তা থেকে মুক্ত'। (সূরা আনআম ৬ : ১২-১৯)

প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা কিছু কমে ও বাড়ে, আল্লাহ তা জানেন। প্রতিটি জিনিস তাঁর কাছে আছে পরিমাণমতো। তিনি গায়িব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী, মহান, সর্বোচ্চ।- তোমাদের কেউ কথা গোপন করে বা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, সবাই তাঁর কাছে সমান। মানুষের জন্য রয়েছে, সামনে ও পেছনে, একের পর এক আগমনকারী প্রহরী, যারা আল্লাহর নির্দেশে তাকে হেফাযত করে। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো কওমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আর যখন আল্লাহ কোনো জাতির মন্দ চান, তখন তা প্রতিহত করা যায় না এবং তাদের জন্য তিনি ছাড়া কোনো অভিভাবক নেই।

তিনিই তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ, ভীতিকর ও আশা সঞ্চারক। তিনিই উত্তোলিত করেন মেঘ, (প্রবৃদ্ধির) বৃষ্টিতে ভারাক্রান্ত। বজ্রনাদ তাঁরই ভয়ে সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করে আর ফেরেশতারাও। তিনি গর্জনকারী বজ্র প্রেরণ করেন আর তা দিয়ে যাকে ইচ্ছে আঘাত করেন, আর তারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। তিনি শক্তিতে প্রবল, শাস্তিতে কঠোর।

সত্যের আহ্বান তাঁরই।- আর যারা তাকে ছাড়া অন্যদেরকে ডাকে, তারা তাদের ডাকে সামান্যও সাড়া দিতে পারে না। - বরং (তাদের দৃষ্টান্ত) ওই ব্যক্তির মতো, যে তার মুখে পানি পৌঁছবে ভেবে পানির দিকে হাত প্রসারিত করে দেয়, অথচ সে পানি তার মুখে কক্ষনো পৌঁছবে না। আর কাফিরদের ডাক তো শুধু ভ্রষ্টতায় পর্যবসিত হয়।

আসমানে আর জমিনে যা কিছু আছে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর প্রতি সাজদায় অবনত হয় আর তাদের ছায়াগুলোও। বলুন, 'কে আসমানসমূহ ও জমিনের রব?' বলুন, 'আল্লাহ।' বলুন, 'তোমরা কি তাঁকে ছাড়া এমন কিছুকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছ, যারা তাদের নিজদের কোনো উপকার অথবা অপকারের মালিক নয়?' বলুন, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? নাকি অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে?'

তবে কি তারা আল্লাহর এমন শরীক নির্ধারণ করেছে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের কাছে সদৃশ মনে হয়েছে? বলুন, 'আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা; আর তিনি এক, মহাপ্রতাপশালী।' (সূরা রা'দ, ১৩ : ৮-১৬)

আসমান ও জমিনে যারা আছে, তারা তাঁরই মালিকানাধীন, আর তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে, তারা অহংকার-বশে তাঁর ইবাদাত করা হতে বিমুখ হয় না এবং বিরক্তি বোধ করে না। তারা দিন-রাত তাঁর তাসবীহ পাঠ করে, তারা শিথিলতা দেখায় না। তারা (মুশরিকরা) যেসব মাটির দেবতা গ্রহণ করেছে, সেগুলো কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? আসমান ও জমিনে যদি আল্লাহ ছাড়া আরও অনেক ইলাহ থাকত, তবে (আসমান ও জমিন) উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং তারা যা বলে, আরশের অধিপতি আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। তিনি যা করেন, সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না; বরং তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করা হবে। নাকি তারা তাঁকে বাদ দিয়ে অনেক ইলাহ গ্রহণ করেছে? বলুন, 'তোমাদের প্রমাণ নিয়ে আসো। আমার সাথে যারা আছে, এটি তাদের জন্য উপদেশ এবং আমার পূর্বে যারা ছিল, তাদের জন্যও এটাই ছিল উপদেশ।' কিন্তু

তাদের (অর্থাৎ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের) অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না, তাই তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা আম্বিয়া, ২১ : ১৯-২৪)

আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব তাঁরই। তিনিই জীবন দেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ।; তিনি প্রকাশিত, আবার গুপ্ত।; তিনি সকল বিষয়ে সম্যক অবগত। তিনি ছয় দিনে আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি আরশের ওপর উঠেছেন। তিনি জানেন, জমিনে যা কিছু প্রবেশ করে এবং তা থেকে যা কিছু বের হয়; আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। আসমানসমূহ ও জমিনের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই এবং আল্লাহরই দিকে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। তিনিই রাতকে প্রবেশ করান দিনে আর দিনকে প্রবেশ করান রাতে এবং তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত। (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ১-৬)

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ মানুষকে মহাবিশ্বের প্রকৃতি আর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানায়। মহাবিশ্বের মাঝে থাকা স্রষ্টার নিদর্শনগুলোর দিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। মানুষের সামনে এই সত্যটা তুলে ধরে যে, মহান আল্লাহ মহাবিশ্বকে তৈরি করেছেন মানুষের কল্যাণ ও ব্যবহারের জন্য। ইসলাম এ বিষয়গুলো এমনভাবে শেখায়, যা মানবপ্রকৃতি ও বুদ্ধিমত্তাকে আকৃষ্ট করে। মানুষ এর সত্যতা চিনতে পারে সহজাতভাবে। সে বুঝতে পারে, তার চারপাশের সবকিছু এই সত্যের স্বীকৃতি দিচ্ছে। ইসলাম মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে মহাবিশ্বকে নিয়ে জানতে, যাতে মহাবিশ্বের রহস্য এবং বিধানগুলো আবিষ্কার করা যায়, যাতে এগুলো যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে মানুষ। আল্লাহ বলেছেন,

হে মানুষ!; তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত করো, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো। যিনি জমিনকে তোমাদের জন্য বিছানা এবং আসমানকে করেছেন ছাদ এবং আকাশ হতে পানি অবতীর্ণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেছেন। সুতরাং তোমরা জেনে-বুঝে আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না। (সূরা বাকারা, ২ : ২১-২২)

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমিন এবং সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। তারপরও কাফিররা তাদের রবের সমকক্ষ স্থির করে। (সূরা আনআম, ৬ : ১)

আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ওপরে স্থাপন করেছেন খুঁটি ছাড়া, তোমরা তা দেখছো। তারপর তিনি আরশের ওপর উঠেছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়মাধীন করেছেন; প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন, আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমাদের রবের সাক্ষাতের ব্যাপারে তোমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হতে পারো। আর তিনিই জমিনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা ও নদনদী স্থাপন করেছেন। আর প্রত্যেক প্রকারের ফল তিনি জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। আর জমিনে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড, আঙুর বাগান, শস্যক্ষেত্র, একই মূল থেকে উদ্গত বা ভিন্ন ভিন্ন মূল থেকে

উদ্‌গত খেজুর গাছ, যেগুলো একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়, আর স্বাদ-রূপের ক্ষেত্রে সেগুলোর কিছু সংখ্যককে আমরা কিছু সংখ্যকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। নিশ্চয় বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন। (সূরা রা'দ, ১৩ : ২-৪)

তিনিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন। তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা থেকে জন্মায় উদ্ভিদ, যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাকো। তার মাধ্যমে তিনি তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেন ফসল, যাইতুন, খেজুর গাছ, আঙুর এবং সকল ফল-ফলাদি। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন। আর তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত, দিন, সূর্য ও চাঁদকে এবং নক্ষত্ররাজিও তাঁরই নির্দেশে নিয়োজিত। নিশ্চয় এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে অনেক নিদর্শন। আর তিনি তোমাদের জন্য জমিনে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন রঙের বস্তুরাজি। এতে ওই সমস্ত লোকদের জন্য নিশ্চিতভাবে নিদর্শন আছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায়। তিনিই সমুদ্রকে কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা (মাছের) গোশত খেতে পারো, আর তা থেকে রত্নরাজি সংগ্রহ করতে পারো, যা তোমরা অলংকার হিসেবে পরিধান করো। আর নৌযানগুলোকে তোমরা দেখতে পাও ঢেউয়ের বুক চিরে তাতে চলাচল করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করতে পারো আর শোকর আদায় করতে পারো। আর জমিনে তিনি স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা, যাতে জমিন তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করেছেন নদনদী ও পথসমূহ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারো, আর দিক-দিশা প্রদানকারী চিহ্নসমূহ; আর তারকারাজির সাহায্যেও তারা পথনির্দেশ লাভ করে। কাজেই যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তার মতো, যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ১০-১৭)

যারা কুফরি করে, তারা কি দেখে না—যে, আসমানসমূহ ও জমিন মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে, তারপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবান সবকিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে; তবুও কি তারা ঈমান আনবে না? আর পৃথিবীতে আমি স্থাপন করেছি সুদৃঢ় পর্বত, যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে নড়াচড়া না করে। আর তাতে সৃষ্টি করেছি প্রশস্ত পথ, যাতে তারা পথ পেতে পারে। আর আমি আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ, কিন্তু এ সবের নিদর্শন থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চাঁদ; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৩০-৩৩)

আপনি কি দেখতে পান না—, পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব তিনি তোমাদের কল্যাণ-কাজে লাগিয়ে রেখেছেন আর নৌযানগুলো সমুদ্রে চলাচল করে তাঁর হুকুমেই? তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন, যাতে তা পৃথিবীতে পতিত না হয় তাঁর অনুমতি ছাড়া। আল্লাহ মানুষের প্রতি নিশ্চিতই বড়ই করুণাশীল, বড়ই দয়াবান। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৬৫)

আর অবশ্যই আমি তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করেছি সাতটি আসমান এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে মোটেই উদাসীন নই। আমি আকাশ থেকে পরিমিত বৃষ্টি বর্ষণ করি, অতঃপর আমি তা জমিনে সংরক্ষণ করি আর অবশ্যই আমি সেটাকে অপসারণ করতেও সক্ষম। তারপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙুরের বাগানসমূহ সৃষ্টি করেছি। তাতে তোমাদের জন্য প্রচুর ফল থাকে। আর তা থেকেই তোমরা খাও। (সূরা মুমিনূন, ২৩ : ১৭-১৯)

আপনি কি দেখেন না—,আল্লাহ্ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, তারপর তিনি তা একত্র করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর আপনি দেখতে পান তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বারিধারা; অতঃপর তিনি আকাশে স্থিত মেঘমালার পাহাড় থেকে শিলা বর্ষণ করেন, অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছে, তা দিয়ে আঘাত করেন আর যার কাছ থেকে ইচ্ছে, তা সরিয়ে নেন। এর বিদ্যুতের ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়। আল্লাহ্ দিন ও রাতের আবর্তন ঘটান, নিশ্চয়ই এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য রয়েছে শিক্ষা। (সূরা নূর, ২৪ : ৪৩-৪৪)

আপনি কি আপনার রবের প্রতি লক্ষ করেন না, কীভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেন? তিনি চাইলে ছায়াকে অবশ্যই স্থির রাখতে পারতেন। সূর্যকেই আমি করেছি তার (অর্থাৎ ছায়ার) নির্দেশক। অতঃপর আমি তাকে নিজের দিকে গুটিয়ে নিই ধীরে ধীরে ক্রমাগতভাবে। তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে করেছেন আরামপ্রদ আর দিনকে করেছেন (নিদ্রারূপী সাময়িক মৃত্যুর পর) আবার জীবন্ত হয়ে ওঠার সময়। আর তিনিই তাঁর রহমতের বৃষ্টির আগে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমি আকাশ হতে পবিত্র পানি বর্ষণ করি, যা দিয়ে আমি মৃত জমিনকে জীবিত করে তুলি এবং তৃষ্ণা নিবারণ করি আমার সৃষ্টির অন্তর্গত অনেক জীবজন্তুর ও মানুষের। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৪৫-৪৯)

মৃত জমিন তাদের জন্য একটি নিদর্শন, যাকে আমি জীবিত করি আর তা থেকে আমি উৎপন্ন করি শস্য, যা থেকে তারা খায়। আর আমি তাতে খেজুর ও আঙুরের বাগান তৈরি করি, আর তাতে প্রবাহিত করি ঝরনাধারা। যাতে তারা তার ফল খেতে পারে, অথচ তাদের হাত তা বানায়নি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

পবিত্র ও মহান সে সত্তা, যিনি সকল জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন, জমিন যা উৎপন্ন করেছে তা থেকে, মানুষের নিজেদের মধ্য থেকে এবং সে সবকিছু থেকেও, যা তারা জানে না। আর রাত তাদের জন্য একটি নিদর্শন; আমি তা থেকে দিনকে সরিয়ে নিই, ফলে তখনই তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট পথে, এটা মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)-র নির্ধারণ। আর চাঁদের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি মানযিলসমূহ, অবশেষে সেটি খেজুরের শুষ্ক পুরাতন শাখার মতো হয়ে যায়। সূর্যের জন্য সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া, আর রাতের জন্য সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা, আর প্রত্যেকেই কক্ষপথে ভেসে বেড়ায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৩৩-৪০)

বলুন, ‘তোমরা কি তাঁকেই অস্বীকার করছো, যিনি জমিনকে সৃষ্টি করেছেন দুদিনে? আর তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ তৈরি করছো? তিনিই তো বিশ্বজগতের রব। (জমিন সৃষ্টির পর) তার বুকে তিনি সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, জমিনকে বরকতমণ্ডিত করেছেন, আর তাতে চারদিনে প্রার্থীদের জন্য সমভাবে খাদ্য নিরূপণ করে দিয়েছেন। তারপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন, যা (পূর্বে) ছিল ধোঁয়া। অতঃপর তিনি আসমান ও জমিনকে বললেন, ‘তোমরা উভয়ে আসো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়।’ তারা বলল, ‘আমরা এআসলাম অনুগত হয়ে।’ অতঃপর তিনি সেগুলোকে সাত আসমানে পরিণত করলেন দুদিনে আর প্রত্যেক আসমানকে তার বিধিব্যবস্থা ওহির মাধ্যমে প্রদান করলেন। আর আমি নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এ হলো মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর সুনির্ধারিত (ব্যবস্থাপনা)। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৯-১২)

তারা কি তাদের ওপরে আসমানের দিকে তাকায় না, কীভাবে আমি তা বানিয়েছি এবং তা সুশোভিত করেছি? আর তাতে কোনো ফাটল নেই। আর আমি জমিনকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে উদ্‌গত করেছি প্রত্যেক প্রকারের সুদৃশ্য উদ্ভিদ, আল্লাহর অনুরাগী প্রত্যেক বান্দার জন্য জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ। আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি। অতঃপর তা দ্বারা আমি উৎপন্ন করি বাগ-বাগিচা ও কর্তনযোগ্য শস্যদানা এবং সমুন্নত খেজুর গাছ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর; বান্দাদের রিয্‌কস্বরূপ। আর আমি পানি দ্বারা মৃত শহর সঞ্জীবিত করি। এভাবেই উত্থান ঘটবে (কবর থেকে মানুষদের)। (সূরা ক্বাফ, ৫০ : ৬-১১)

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ মানুষকে প্রাণ ও প্রাণের উৎসের ব্যাপারে জানায়। প্রাণের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে, যা অনুধাবন করতে পারে মানুষ। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ জানায় প্রাণিজগতের সাথে মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাও। মানুষ এবং অন্য সব প্রাণী মহান আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁরই বান্দা। সবাই অস্তিত্বে এসেছে মহান আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী। সব প্রাণীর মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা তাদের একক উৎস থেকে আগমনের ইঙ্গিত দেয়। তবে অন্য সব প্রাণীর ওপর মহান আল্লাহ মানুষকে কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা দিয়েছেন। ইসলাম মানুষকে মহান আল্লাহর এই নিয়ামাতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আর আমি সকল প্রাণবান জিনিসকে সৃষ্টি করলাম পানি থেকে… (সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৩০)

আর আল্লাহ্ প্রত্যেক জীবকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের কোনোটি পেটে ভর দিয়ে চলে, কোনোটি চলে দুপায়ের ওপর, আবার কোনোটি চার পায়ের ওপর চলে। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। (সূরা নূর, ২৪ : ৪৫)

ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোনো জীব নেই, আর দুডানা সহযোগে উড্ডয়নশীল এমন কোনো পাখি নেই, যারা তোমাদের মতো একটি উম্মাত নয়। এ কিতাবে আমরা কোনো কিছুই বাদ দিইনি; অতঃপর তাদেরকে তাদের রবের দিকে একত্র করা হবে। (সূরা আনআম, ৬ : ৩৮)

আর জমিনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিয্‌কের দায়িত্ব আল্লাহরই এবং তিনি জানেন তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি। সবকিছুই আছে স্পষ্ট কিতাবে। (সূরা হূদ, ১১ : ৬)

আর এমন কত জীবজন্তু রয়েছে, যারা নিজদের রিয্‌ক মজুদ করে না, আল্লাহই তাদের রিয্‌ক দেন এবং তোমাদেরও। আর তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (সূরা হিজর, ২৯ : ৬০)

…আপনি জমিনকে দেখতে পান শুষ্কাবস্থায়, অতঃপর যখনই আমি তাতে পানি বর্ষণ করি, তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্‌গত করে সকল প্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৫)

তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। আর তিনি জমিনকে জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর। আর এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে। (সূরা রূম, ৩০ : ১৯)

মৃত জমিন তাদের জন্য একটি নিদর্শন। যাকে আমি জীবিত করি আর তা থেকে আমি উৎপন্ন করি শস্য, যা থেকে তারা খায়। আর আমি তাতে খেজুর ও আঙুরের বাগান তৈরি করি, আর তাতে প্রবাহিত করি- ঝরনাধারা। যাতে তারা তার ফল খেতে পারে, অথচ তাদের হাত তা বানায়নি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? পবিত্র ও মহান সে সত্তা, যিনি সকল জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন, জমিন যা উৎপন্ন করেছে তা থেকে, মানুষের নিজেদের মধ্য থেকে এবং সে সবকিছু থেকেও, যা তারা জানে না। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৩৩-৩৬)

তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং গৃহপালিত জন্তুর মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন জোড়া। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোনোকিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা শুরা, ৪২ : ১১)

যিনি আকাশ থেকে পরিমিত পানি বর্ষণ করেন, যা দিয়ে তিনি মৃত ভূ-ভাগকে সঞ্জীবিত করেন। এভাবেই তোমাদেরকে বের করা হবে। তিনি সবকিছুকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন। আর তোমাদের জন্য নৌযান ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আরোহণ করো, যাতে তোমরা যখন তাদের পিঠে স্থির হয়ে বসো, তখন যেন তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো আর বলো, 'মহান ও পবিত্র তিনি, যিনি এগুলোকে আমাদের (ব্যবহারের জন্য) বশীভূত করে দিয়েছেন, আমরা এগুলোকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ১১-১৩)

অতঃপর মানুষ যেন তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ করে! নিশ্চয় আমি প্রচুর পরিমাণে পানি বর্ষণ করি। তারপর জমিনকে যথাযথভাবে বিদীর্ণ করি। অতঃপর তাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য, আঙুর ও শাক-সবজি, যাইতুন, খেজুর, ঘনবৃক্ষ শোভিত বাগ-বাগিচা, আর নানান জাতের ফল আর ঘাস-লতাপাতা; তোমাদের আর তোমাদের গৃহপালিত পশুগুলোর ভোগের জন্য। (সূরা আবাসা, ৮৭ : ২৪-৩২)

আপনি আপনার সুমহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন অতঃপর করেছেন (দেহের প্রতিটি অঙ্গকে) সামঞ্জস্যপূর্ণ। যিনি সকল বস্তুকে পরিমাণমতো সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর (জীবনে চলার) পথনির্দেশ করেছেন। আর যিনি তৃণ-লতা বের করেন। তারপর তা কালো খড়-কুটায় পরিণত করেন। (সূরা আলা, ৮৭ : ১-৫)

আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যত জীবজন্তু ফেরেশতারা, সমস্তই আল্লাহকে সাজদা করে; তারা অহংকার করে না। তারা তাদের উপরস্থ রবকে ভয় করে এবং তাদেরকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়, তারা তা করে। (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ৪৯-৫০)

আপনি কি দেখেন না—~~যে,~~ আসমানসমূহ ও জমিনে যারা আছে, তারা এবং সারিবদ্ধভাবে উড্ডীয়মান পাখিরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে তার ইবাদাতের ও পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি। আর তারা যা করে, সে বিষয় আল্লাহ সম্যক অবগত। (সূরা নূর, ২৪ : ৪১)

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ মানুষকে তার নিজের উৎস, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য, মহাবিশ্বে তার অবস্থান, মহান আল্লাহর প্রতি তার দাসত্ব এবং এই দাসত্বের শর্তগুলো জানিয়ে দেয়। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ মানুষকে জানায় তার শক্তি আর দুর্বলতার কথা, দায়িত্ব আর

কর্তব্যের কথা। দুনিয়া এবং আখিরাতের সাথে জড়িত ছোট-বড় সব দিকের ব্যাপারে ইসলাম মানুষকে জানিয়ে দেয়। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে এ বিষয়গুলো উঠে এসেছে। এ ব্যাপারে কুরআনের কিছু আয়াত আমরা তুলে ধরছি,

> আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুকনো ঠনঠনে, কালচে কাদামাটি থেকে। আর ইতঃপূর্বে জিনকে সৃষ্টি করেছি উত্তপ্ত অগ্নিশিখা থেকে। স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, 'আমি একজন মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি শুকনো ঠনঠনে কালচে মাটি থেকে। অতঃপর যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার পক্ষ থেকে রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সাজদাবনত হয়ো।' অতঃপর ফেরেশতারা সকলেই সাজদা করল। ইবলীস ছাড়া, সে সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল। (সূরা হিজর, ১৫ : ২৬-৩১)

> আর অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট বাঁধা রক্তে, অতঃপর জমাট বাঁধা রক্তকে পরিণিত করি মাংসপিণ্ডতে, অতঃপর মাংসপিণ্ডকে পরিণত করি হাড্ডিতে, অতঃপর হাড্ডিকে আবৃত করি মাংস দিয়ে, অতঃপর তাকে এক নতুন সৃষ্টিতে উন্নীত করি। অতএব (দেখে নিন) সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কতই না মহান! এরপর অবশ্যই তোমরা মরবে। তারপর কিয়ামাতের দিন অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে। (সূরা মুমিনূন, ২৩ : ১২-১৬)

> আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্যই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত করবে। আমি তাদের কাছ থেকে কোনো রিয্ক চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে। নিশ্চয় আল্লাহই তো রিয্কদাতা, প্রবল শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (সূরা যারিয়াত, ৫ : ৫৬-৫৮)

> আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বললেন, 'নিশ্চয় আমি জমিনে খলীফা সৃষ্টি করছি', তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে ফাসাদ ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আর আমরা আপনার হামদসহ তাসবীহ পাঠ করি এবং পবিত্রতা ঘোষণা করি।' তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি তা জানি, যা তোমরা জানো না।' (সূরা বাকারা, ২ : ৩০)

> আর অবশ্যই আমি আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সাগরে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে উত্তম রিয্ক দান করেছি আর আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাদের অনেকের ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৭০)

> আমি বললাম, 'তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট কোনো হিদায়াত আসবে, তখন যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।' আর যারা কুফরি করবে ও আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে, তারাই জাহান্নামি; সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। (সূরা বাকারা, ২ : ৩৮-৩৯)

> কালের শপথ! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে (ডুবে) আছে, তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে

সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে। (সূরা আসর, ১০৩ : ১-৩)

আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয়, তাও আমি জানি। আর আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনির চেয়েও নিকটতর। (সূরা ক্বাফ, ৫০ : ১৬)

নিঃসন্দেহে আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে। (সূরা বালাদ, ৯০ : ৪)

মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৭৭)

...মানুষ অধিকাংশ বিষয়েই বিতর্ককারী। (সূরা কাহ্‌ফ, ১৮ : ৫৪)

নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে, তখন সে হয়ে পড়ে অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠিত। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, তখন সে হয়ে পড়ে অতিশয় কৃপণ। তবে সালাত আদায়কারীগণ ছাড়া। (সূরা মা'আরিজ, ৭০: ১৯-২২)

আল্লাহ তোমাদের ভার লঘু করতে চান, কারণ মানুষকে দুর্বলরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। (সূরা নিসা, ৪ : ২৮)

আর মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে, তখন সে শুয়ে, বসে বা দাঁড়িয়ে আমাদেরকে ডেকে থাকে। অতঃপর আমরা যখন তার দুঃখ-দৈন্য দূর করি, তখন সে এমনভাবে চলতে থাকে, যেন তাকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর তার জন্য সে আমাদেরকে ডাকেইনি। এভাবে সীমালঙ্ঘনকারীদের কাজ তাদের কাছে শোভনীয় করে দেওয়া হয়েছে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ১২)

আমি যদি মানুষকে আমার পক্ষ থেকে রহমত আস্বাদন করাই, অতঃপর তা তার থেকে ছিনিয়ে নিই, তখন সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। আর দুঃখদুর্দশা স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে নিয়ামাত আস্বাদন করাই, তাহলে সে অবশ্যই বলবে, 'আমার থেকে বিপদ-আপদ দূর হয়ে গেছে।'; আর সে হবে অতি উৎফুল্ল, অহংকারী। (সূরা হূদ, ১১ : ৯-১০)

মানুষ (তার নির্বুদ্ধিতার কারণে কল্যাণকর ভেবে) অকল্যাণ প্রার্থনা করে, যেমনভাবে কল্যাণ প্রার্থনা করা উচিত। মানুষ বড়ই তাড়াহুড়াকারী। (সূরা ইসরা, ১৭ : ১১)

বাস্তবেই মানুষ সীমালঙ্ঘনই করে থাকে, কেননা সে নিজকে মনে করে স্বয়ংসম্পূর্ণ। (সূরা আলাক্ব, ৯৬ : ৬-৭)

শপথ নফসের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর! অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সেই সফলকাম হয়েছে, যে নিজ নফসকে পবিত্র করেছে। সেই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজ নফসকে কলুষিত করেছে। (সূরা শামস,

৯১ : ৭-১০)

> অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠনে। তারপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি হীনদের হীনতম রূপে। কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য তো আছে অফুরন্ত প্রতিদান। (সূরা তীন, ৯৫ : ৪-৬)

কুরআন মানুষের সামনে বিভিন্ন মৌলিক বাস্তবতার সংজ্ঞা, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য এবং সামগ্রিক ব্যাখ্যা তুলে ধরে। এগুলো ইসলামি বিশ্বাসের ইট, কাঠ, পাথর আর ভিত্তিমূল। এই বিশ্বাসের উপাদান আর নকশা এসেছে মহান আল্লাহর কাছ থেকে। অন্য উৎস থেকে কোনোকিছু যোগ করার প্রয়োজন এখানে নেই। অন্য সব উৎস থেকে পাওয়া জ্ঞান অনুমাননির্ভর, ত্রুটিপূর্ণ। এই জ্ঞানের প্রণেতারা নিজেরাই হারিয়ে গেছে চিন্তার মরুপ্রান্তরে। তারা নিজেরাই পথহারা, তারা নিজেরাই খুঁজছে পথপ্রদর্শক।

সমস্ত সৃষ্টির অস্তিত্বকে ইসলাম এক মৌলিক বাস্তবতার সাপেক্ষে ব্যাখ্যা করে। সেই মৌলিক বাস্তবতা হলেন মহান আল্লাহ। মহাবিশ্ব, প্রাণ, মানুষ সবকিছু তাঁর ওপর নির্ভরশীল। এভাবে ইসলাম সবকিছুর সর্বাঙ্গীন ব্যাখ্যা দেয়, মানুষের সব চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষাকে বিবেচনা করে মানুষকে ফেরায় মহান আল্লাহর দিকে।

ইসলাম মানুষকে এক আল্লাহর দিকে ফিরতে বলে নৈতিকতা, মূল্যবোধ, মাপকাঠি, আইন এবং বিধানের ক্ষেত্রেও। কারণ মানুষ এ সবগুলো বিষয়ের পরিপূর্ণ, ত্রুটিহীন উত্তর পাবে কেবল আল্লাহর কাছেই। এভাবে ইসলাম মানুষের জীবনকে সমন্বিত করে। চেতনা ও আচরণে, আকীদা ও জীবনব্যবস্থায়, প্রয়োজনে ও সন্তুষ্টিতে, জীবন ও মৃত্যুতে, প্রচেষ্টা ও গতিতে, স্বাস্থ্য ও রিয্‌কে, দুনিয়াতে এবং আখিরাতে—সব দিক থেকে ইসলাম মানুষকে ওই এক চিরন্তন, মহান সত্তার অনুগত করে। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ মানুষকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে না, তার চেতনাকে করে না বিক্ষিপ্ত কিংবা বিভ্রান্ত। ইসলাম বলে—,ভিন্ন ভিন্ন সমস্যার জন্য ভিন্ন ভিন্ন উৎসের কাছে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই।, প্রয়োজন নেই এলোমেলো পথে ছুটবার, পরস্পরবিরোধী চিন্তার মুখোমুখি হবার। প্রয়োজন শুধু মহান আল্লাহর দিকে ফেরার।

এই সত্যকে বোঝার পর মানুষ তার সব দুআ আর চাহিদা নিয়ে এক আল্লাহর অভিমুখী হয়। সে শুধু তখন আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, কেবল তাঁআল্লাহর ক্রোধকে ভয় করে। সব আশা নিয়ে মানুষ তখন মহান আল্লাহর দ্বারস্থ হয়, তার পূর্ণ সত্তা নিয়ে এক উৎসমুখী হয়। তার জীবন তখন হয় সমন্বিত। ইসলামি জীবনব্যবস্থার অধীনে সমাজে নানা ধরনের ব্যক্তি থাকবে। তাদের সক্ষমতা, মেধা আর কাজের মধ্যে থাকবে নানান পার্থক্য। কিন্তু সবার মূল উদ্দেশ্য হবে এক—,পরিপূর্ণভাবে এক আল্লাহর ইবাদাত করা।

মানুষের জীবনব্যবস্থা যখন মানবপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখনই মানুষের সক্ষমতা উৎকর্ষে পৌঁছায়। মানুষ তখন উপনীত হয় মহাবিশ্বের সাথে এক সূক্ষ্ম ভারসাম্যে। তখন মানুষ যথাযথভাবে তার পবিত্র ভূমিকা পালন করতে পারে এবং এগিয়ে যেতে পারে সর্বোচ্চ অর্জনের পথে। মানুষ সক্ষম হয় বিস্ময়কর সব অর্জন আর কাজে। এই সমন্বিত ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে চমৎকার এবং মহান উদাহরণ ছিলেন প্রথম প্রজন্মের মুসলিমরা, যাদের মাধ্যমে মহান আল্লাহ এই পৃথিবীর বুকে বিস্ময়কর পরিবর্তন এনেছেন এবং মানবজাতির ইতিহাসকে চিরস্থায়ীভাবে প্রভাবিত করেছেন (রদিয়াল্লাহু আনহুম)। যখনই এ ধরনের আরেকটি প্রজন্মের আবিভার্ব ঘটবে; এবং ইন শা আল্লাহ তাদের আবির্ভাব ঘটবেই, তাদের মাধ্যমেও আল্লাহ মহান পরিবর্তন নিয়ে আসবেন। সামনে যত

প্রতিবন্ধকতাই থাকুক না কেন, যত বাধাই আসুক না কেন, তারা সফল হবেন।

জীবনের সমন্বয়ের আরেকটি দিক হলো—ইসলামের মানুষের সমগ্র অস্তিত্ব ও কাজকে ইবাদাতের দিকে ধাবিত করে। ইবাদাতের এই বাস্তবতা প্রকাশ পায় আল্লাহর 'খলীফা' হিসেবে পৃথিবীতে মানুষের ভূমিকার মধ্য দিয়ে। মানবজীবনের এই সমন্বয় ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি। মানুষ যে বাস্তবতাগুলোর মুখোমুখি হয়, ইসলাম সেগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়ার পাশাপাশি মানুষকে দেয় দিকনির্দেশনাও। শুধু ইসলামি জীবনব্যবস্থাতেই মানুষ একই সাথে দুনিয়া এবং আখিরাতের জন্য বাঁচতে পারে। নিজের প্রয়োজন মেটানো এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির অর্জনের জন্য সে কাজ করতে পারে একইসাথে। জীবিকার জন্য সে যখন কাজ করে, তখনো একজন মুমিন মহান আল্লাহর ইবাদাত করে। দৈনন্দিন জীবনের কাজের মধ্য দিয়েও সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। কারণ এসবই পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা হিসেবে তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

ইসলাম ব্যক্তির কাছ থেকে শুধু একটি জিনিস চায়—তার ইবাদাত।; তা সালাত বা সাওম হোক কিংবা দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে ইবাদাত হোক;- সবই যেন এক আল্লাহর জন্য হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে সে যেন মহান আল্লাহর কথা স্মরণ করে। লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হিসেবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিকে যেন সামনে রাখে আন্তরিকভাবে। সে যেন মহান আল্লাহর ঠিক করে দেওয়া সীমানা লঙ্ঘন না করে। বলে রাখা ভালো, ইসলামে জায়িয কাজের সীমানা বিস্তৃত। যা কিছু কল্যাণময়, তা এই সীমানার ভেতরেই আছে।

ব্যাপকতার এই বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামি জীবনব্যবস্থা পরিপূর্ণ। এখানে আছে গভীর বিশ্বাস আর বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। বিশ্বাস ও কাজের এই সমন্বয় ইসলামি দ্বীনের বৈশিষ্ট্য। এই দুটিকে বিচ্ছিন্ন করার অর্থ দ্বীন ইসলামকে নষ্ট করে ফেলা। ইসলামি ফিকহের বইগুলোতে আমরা ইবাদাত এবং মুআমালা, অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটা শ্রেণিবিভাজন দেখি। প্রাথমিকভাবে এই বিভাজন আনা হয়েছিল অ্যাকাডেমিকভাবে দ্বীনের বিভিন্ন দিককে গুছিয়ে তা সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপনের জন্য। কিন্তু দুঃখজনকভাবে সময়ের সাথে সাথে অনেকের মধ্যে এ ব্যাপারে কিছু ভুল ধারণা তৈরি হয়ে গেছে। অনেক মানুষ এখন মনে করেন—ফিকহের বইগুলোতে 'ইবাদাত' অধ্যায়ে যে বিষয়গুলোর আলোচনা করা হয়েছে, ইবাদাত কেবল তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মানুষের দৈনন্দিন জীবনও যে ইবাদাত হতে পারে, এই উপলব্ধি ম্লান হয়ে গেছে ধীরে ধীরে। নিঃসন্দেহে এটি ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের গুরুতর বিকৃতি এবং এই বিকৃতির ফলে মুসলিম সমাজে বিচ্যুতি এসেছে।

এমন কোনো বৈধ মানবীয় কাজ নেই, ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ অনুযায়ী যেটাকে ইবাদাত বলা যায় না, অথবা ইবাদাতে পরিণত করা যায় না। মূলত ইসলামি জীবনব্যবস্থার উদ্দেশ্যই হলো ইবাদাতের এই ব্যাপক অর্থকে বাস্তবায়ন করা। কোনো বিচারব্যবস্থা, অর্থনৈতিকব্যবস্থা, ফৌজদারি, দেওয়ানি কিংবা পারিবারিক আইনবিধি আর নিয়মনীতি প্রণয়ন ইসলামি জীবনধারার চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো—প্রকৃত অর্থে এক আল্লাহর ইবাদাতকে প্রতিষ্ঠা করা। কারণ মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য। মানবীয় কোনো কাজকে ততক্ষণ পর্যন্ত ইবাদাত বলা যাবে না, যতক্ষণ না তা শুধু আল্লাহর জন্য হচ্ছে, আল্লাহর নির্ধারিত নীতিসমূহের আলোকে হচ্ছে এবং অন্তরে এই বিশ্বাস নিয়ে হচ্ছে যে, কেবল আল্লাহ এবং আল্লাহই ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র সত্তা। এই বৈশিষ্ট্য না থাকলে কোনো কাজ কখনই ইবাদাত হতে পারে না, বরং তা আল্লাহর দ্বীনের প্রতি বিদ্রোহের শামিল।

কুরআনের দিকে তাকালে আমরা দেখি—,-যেগুলোকে মুআমালাত বা দৈনন্দিন জীবনের কাজ বলা হয়, আর যেগুলোকে বিশেষভাবে ইবাদাত বলা হয়; -তাদের আলোচনা পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। কুরআনের আলোচনায় এ দুই ধরনের কার্যক্রম গভীরভাবে সম্পর্কিত। কারণ এ দুটোই আসলে সেই ইবাদাতের অংশ, যে ইবাদাত অর্থ হলো এক আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং রুবুবিয়্যাত ও সার্বভৌমত্ব কেবল তাঁরই বলে সাব্যস্ত করা। আর এই ইবাদাত করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষকে।

কিন্তু ধীরে ধীরে মুসলিম মানসে একটা চিন্তা চেপে বসল-:—-জীবনের অল্প কিছু ক্ষেত্রে মানুষ ইসলামি শারীআ অনুযায়ী কাজ করবে, বাকি ক্ষেত্রগুলোতে শারীআর বদলে অনুসরণ করা যাবে অন্য যেকোনো ব্যবস্থার। ইবাদাতের ক্ষেত্রে মানুষ আল্লাহর আনুগত্য করবে; কিন্তু সমাজ, অর্থনীতি আর শাসনের ক্ষেত্রে আনুগত্য করবে অন্য কারও। এসব ক্ষেত্রে তাদের এমন সব ছোট ছোট দেবতা থাকবে, যাদের কাছ থেকে তারা মহান আল্লাহ তাআলার বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিধান আর জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

নিঃসন্দেহে এটি মারাত্মক রকমের ভুল ধারণা। ইসলাম একটি অবিভাজ্য একক। ইসলামের মধ্যে যে বিভাজন করতে চায়, সে ইসলামের সমন্বিত -পরিপূর্ণতার বিরুদ্ধে এবং কার্যত দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। যারা আন্তরিভাবে দ্বীন ইসলাম পালন করতে চায়, নিজ অস্তিত্বের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে চায়, এই সত্য তাদেরকে চিনতে হবে এবং একে পূর্ণ গুরুত্ব দিতে হবে।

আমরা যখন মহান আল্লাহর বড়ত্ব এবং ইবাদাতের এই গভীর, তাৎপর্যপূর্ণ অর্থকে অনুধাবন করব; যখন আমরা অনুধাবন করব কেবল আল্লাহ আমাদের মালিক, দাসত্ব কেবল তাঁরই প্রতি, তখন আমরা বুঝব—-মানুষের জন্য সবচেয়ে সম্মানের অবস্থান হলো —মহান আল্লাহর একান্ত অনুগত দাস হওয়া। এই আনুগত্য ও অঙ্গীকার ছাড়া মানবীয় উৎকর্ষ অর্জন করা যায় না।

নিঃসন্দেহে সঠিক আকীদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরো জীবনব্যবস্থা আকীদার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এটিই ঈমানের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। মানুষের জীবন সর্বোত্তম পর্যায়ে উন্নীত হয়, সবচেয়ে অর্থবহ হয়ে ওঠে, যখন তা সম্পূর্ণভাবে মহান আল্লাহর ইবাদাতে নিবেদিত হয়, যখন জীবন ইবাদাতের সমার্থকে পরিণত হয়। মানুষের ছোট-বড় প্রতিটি কাজ যখন ইবাদাতের অংশ হয়ে যায়। আর এটিই তাওহীদ এবং সমন্বিত জীবনের প্রকাশ। আর এর সর্বোত্তম বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাই আমাদের নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনে। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই উৎকর্ষের সর্বোচ্চ মাত্রা অর্জন করেছিলেন। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন আল-ইসরা ওয়াল মি'রাজ-এর রাতে।

> মহা কল্যাণময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার ওপর ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী কিতাব) নাযিল করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ১)

> পবিত্র ও মহীয়ান তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার চারপাশকে আমি কল্যাণময় করেছি। তাকে আমার নিদর্শনাবলি দেখানোর জন্য, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা ইসরা, ১৭ : ১)

ইসলামের সাথে অন্যান্য ওয়ার্ল্ডভিউয়ের পার্থক্য এবং ইসলাম কীভাবে দুনিয়াতে এবং আখিরাতে মানুষকে সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছে দেয়, তা নিয়ে মুহাম্মাদ আসাদ তাত্তার বইতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন। 'ইসলামের খোলা পথ' শিরোনামের অধ্যায়ে

তিনি বলেছেন,

> ইসলামে ইবাদাতের ধারণা অন্যান্য ধর্মের চেয়ে আলাদা। ইবাদাত বলতে এখানে কেবল ভক্তিমূলক কিছু আচার-অনুষ্ঠানকে বোঝানো হয় না। কেবল সালাত আদায়, সিয়াম পালন, আর হাজ্জ করাই ইবাদাত নয়,-। বরং মানুষের দৈনন্দিন জীবনও ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয় মহান আল্লাহর ইবাদাত, তাহলে অবশ্যই জীবনের সব দিককে আমাদের দেখতে হবে একটি বিস্তৃত বহুমাত্রিক নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে। কাজেই আমাদের সব কাজ; আপাতভাবে তা যত তুচ্ছই মনে হোক না কেন, ইবাদাত হিসেবে করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি কাজ এই জ্ঞানের সাথে করতে হবে যে, এগুলো মহান আল্লাহর সর্বজনীন পরিকল্পনার অংশ। একজন সাধারণ মানুষের জন্য এমন অবস্থায় পৌঁছানো কঠিন। এটি অনেক দূরবর্তী এক আদর্শ। কিন্তু আদর্শকে অস্তিত্বে নিয়ে আসাই কি ধর্মের উদ্দেশ্য নয়?
>
> ...ইসলামের অবস্থান স্পষ্ট। ইসলাম আমাদের শেখায়—
>
> প্রথমত, এই জীবনের সত্যিকারের উদ্দেশ্য মানবজীবনের সব ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর ইবাদাত করা।
>
> দ্বিতীয়ত, বস্তুগত এবং আত্মিক;- জীবনকে দুই ভাগে ভাগ করলে লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। আমাদের চিন্তা ও কাজকে, বস্তুগত আর আস্তিক জীবনকে একীভূত করতে হবে। দুইয়ে মিলে এক ভারসাম্যপূর্ণ সম্পূর্ণতা গড়ে উঠবে। তাওহীদের বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটাতে হবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে সমন্বিত এবং একীভূত করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে।
>
> এ মনোভাবের ফলে যৌক্তিকভাবেই ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে নানা পার্থক্য দেখা যায়। ইসলাম শুধু মানুষ এবং স্রষ্টার মধ্যে মেটাফিযিক্যাল সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে না, ব্যক্তির সাথে সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতার সম্পর্ককেও ব্যাখ্যা করে।
>
> যেভাবে আমরা ইবাদাতকে ব্যাখ্যা করলাম, এই ব্যাপক অর্থে ইবাদাতই হলো মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই বিশ্বাসের মাধ্যমেই মানুষ তার পার্থিব জীবনে উৎকর্ষে পৌঁছাতে পারে। সব ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে কেবল ইসলামই বলে, দুনিয়ার জীবনে ব্যক্তিগত উৎকর্ষ অর্জন করা সম্ভব।
>
> খ্রিষ্টধর্মের মতো ইসলাম কামনাবাসনাকে চেপে রাখার কথা বলে না। হিন্দু ধর্মের মতো জন্ম, মৃত্যু আর পুনর্জন্মের নিরন্তর চক্রের কথা বলে না। বৌদ্ধ ধর্মের মতো বলে না যে, নিজেকে ধ্বংস করে- বিশ্বের সাথে সব আবেগ-অনুভূতির সম্পর্কে ছিঁড়ে ফেলার পরই কেবল উৎকর্ষ অর্জন করা সম্ভব। ইসলাম স্পষ্টভাবে বলে, পার্থিব সম্ভাবনাগুলো কাজে লাগানোর মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীর জীবনে উৎকর্ষে পৌঁছাতে পারে।[3]

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সর্বাঙ্গীন ব্যাপকতা মানবপ্রকৃতিকে আকৃষ্ট করে, সন্তুষ্ট করে। এই ওয়ার্ল্ডভিউ তাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন, টুকরো টুকরো করে না। ইসলাম মানুষের জীবনকে করে সমন্বিত। ইসলাম মানুষকে রক্ষা করে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে। যেকোনো পরিস্থিতি, যেকোনো মুহূর্তে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া থেকে ইসলাম মানুষকে

হেফাযত করে। আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে, আল্লাহর শারীআকে প্রত্যাখ্যান করে—এমন কারও মুখাপেক্ষী হওয়া ও অধীনতা গ্রহণ করা থেকেও মানুষকে রক্ষা করে ইসলাম।

বিধান, কর্তৃত্ব ও রাজত্ব শুধুই আল্লাহর। কেবল ইবাদাতের ক্ষেত্রে নয়, মুআমালাতের ক্ষেত্রেও। সীমিত কিছু ক্ষেত্রে নয়, সব ক্ষেত্রে। দুনিয়া ও আখিরাতে, আসমানে ও জমিনে, দৃশ্যমান জগতে এবং গায়িবের জগতে, দুআ ও কাজের ক্ষেত্রে, স্থিরতা ও গতিশীলতায়—রাজত্ব আর কর্তৃত্ব এক আল্লাহর। একথা সত্য প্রত্যেক দিকে, প্রত্যেক স্থানে, প্রত্যেক সময়ে, প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক শ্বাসপ্রশ্বাসে।

আর তিনিই সত্য ইলাহ আসমানে এবং তিনিই সত্য ইলাহ জমিনে। আর তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৮৪)

---

[1] সাম্প্রতিক সময়ে বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং ও লরেন্স ক্রউস-সহ অনেকেই শূন্য থেকে মহাবিশ্বের উৎপত্তির ব্যাপারে কিছুর তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। The Grand Design বইয়ে মহাবিশ্বের উৎপত্তির ব্যাপারে হকিং-এর মূল বক্তব্য হলো : পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্রগুলো যদি কার্যকর থাকে; বিশেষ করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সূত্রগুলো, তাহলে শূন্য থেকেই মহাবিশ্বের উৎপত্তি হতে পারে। এর জন্য কোনো অতিপ্রাকৃত কারণের (অর্থাৎ স্রষ্টার) প্রয়োজন নেই।

আরেক বিজ্ঞানী নিও-অ্যাইথিস্ট লরেন্স ক্রউস তার বই A Universe from Nothing–এ বলেছেন : কোয়ান্টাম মাধ্যাকর্ষণ কেবল মহাবিশ্বকে শূন্য থেকে উদ্ভূত হতে কেবল অনুমতি দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, একেবারে অবশ্যম্ভাবী করে তোত্তুলে।

এধরনের ব্যাখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন আপত্তি তোলা যায়।- এখানে দুটি উল্লেখ করা হলো :

১. এখানে ‘শূন্য’ বলতে অনস্তিত্বকে বোঝানো হচ্ছে না, বরং শূন্য বলতে ‘Quantum Vaccum’ বা ‘কোয়ান্টাম শূন্যতা’ বোঝানো হচ্ছে। কিন্তু কোয়ান্টাম শূন্যস্থান আসলে প্রকৃত অর্থে শূন্য নয়, কোয়ান্টাম শূন্যস্থানেও প্রতিনিয়ত কিছু কণা-প্রতিকণা সৃষ্টি হচ্ছে আর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, থেকে যাচ্ছে কোয়াণ্টাম শক্তি। একে বলা হয় কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশানস (Quantum fluctuations)। অর্থাৎ এখানে মূলত অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের কথা বলা হচ্ছে না, বরং ‘কিছু’ থেকে ‘অন্য কিছু’র সূচনার কথা বলা হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, সেই প্রথম ‘কিছু’টা কোথা থেকে এল? এই ব্যাখ্যা আসলে মূল প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না, বরং মূল প্রশ্নের আগে অতিরিক্ত একটা ধাপ যুক্ত করছে কেবল।

২. এখানে মহাবিশ্বের অস্তিত্বের আগে মহাজাগতিক নিয়ম বা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নিয়মগুলোর অস্তিত্ব ছিল বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু মহাবিশ্বের সূচনার আগে এই সূত্রগুলোর অস্তিত্ব কীভাবে থাকতে পারে? সেগুলো কেবল বিমূর্ত গাণিতিক সূত্র হিসেবে বিরাজমান ছিল? বিমূর্ত গাণিতিক সূত্র থেকে কীভাবে বস্তুর জন্ম হতে পারে? আর সেই বিমূর্ত সূত্রগুলোর অবস্থান কোথায় ছিল? সেগুলো কোথা থেকে এল?

মূলত এসব ‘ব্যাখ্যা’ সেই অনুমান আর কল্পনানির্ভরতা, চিন্তার সেই মরুপ্রান্তর আর গোলকধাঁধার আধুনিক দৃষ্টান্ত, যা নিয়ে এ বইতে বারবার সাইয়্যিদ কুতুব আলোচনা করেছেন।

এ ব্যাপারে আরও জানার জন্য দেখতে পারেন :

Albert, David. "On the origin of everything." The New York Times, (2012).

Horgan, John. "Is Lawrence Krauss a physicist, or just a bad philosopher?." Scientific American (2015)

Horgan, John. "Science will never explain why there’s something rather than nothing." Scientific American (2012)। (অনুবাদক)

[2] দৃশ্যমান মহাবিশ্বে (বা মহাবিশ্বের যতটুকু আমরা দেখতে সক্ষম হয়েছি) গ্যালাক্সির সংখ্যা ২ ট্রিলিয়ন। (ইউরোপীয়ান স্পেইস অবসারভেটরি)। দৃশ্যমান মহাবিশ্বে গ্রহের সংখ্যাটা কারও মতে ১ অক্টলিয়ন = ১-এর পর ২৪ টি শূন্য, আর কারও মতে ১ সেপ্টিলিয়ন = ১-এর পর ২১ টি শূন্য ।

ষাটের দশকে ধারণা করা হতো, কোনো গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকার জন্য শুধু দুটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের প্রয়োজন :

১. সঠিক ধরনের নক্ষত্র (star) এবং

২. সেই সঠিক ধরনের নক্ষত্র থেকে সঠিক দূরত্বে অবস্থিত একটি গ্রহ।

সঠিক ধরনের নক্ষত্র কারণ, যেকোনো ধরনের নক্ষত্র হলেই তা প্রাণের জন্য সহায়ক হবে না। আর সঠিক দূরত্ব বলার কারণ হলো, প্রাণের উপযোগী হতে হলে গ্রহের তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকতে হবে। কোনো গ্রহের অবস্থান নক্ষত্রের খুব বেশি কাছে বা দূরে হলে সেই গ্রহের তাপমাত্রা প্রাণের জন্য সহায়ক হবে না। অর্থাৎ কোনো গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকার জন্য এই দুটি চলকের (variable) নির্দিষ্ট (অথবা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে) মান থাকা আবশ্যক। মহাকাশবিজ্ঞানী কার্ল স্যাইগান ১৯৬৬ প্রথম এই ধারণার কথা ঘোষণা করেন। স্যাইগান এবং তার রিসার্চ টিম হিসেব করে দেখেছিলেন—এই দুটো চলক অনুযায়ী মহাবিশ্বের সব নক্ষত্রের (Star) মধ্যে কেবল ০.০০১% নক্ষত্রের পক্ষে প্রাণের জন্য সহায়ক হওয়া সম্ভব।

এটা ছিল ষাটের দশকের ধারণা। পরবর্তী প্রায় অর্ধ শতকে প্রাণের অস্তিত্বের জন্য আবশ্যক এরকম আরও দুইশটি প্যারামিটার/চলক খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। অর্থাৎ স্যাইগানের দাবিমতো ২ টি নয়, বরং কোনো গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের জন্য ২০০ টির মতো চলকের সুনির্দিষ্ট মান থাকা আবশ্যক। মনে রাখবেন, কেবল দুটো প্যারামিটারের কারণে মহাবিশ্বের সব নক্ষত্রের (Star) মধ্যে প্রাণের উৎপত্তির জন্য সহায়ক হতে পারে; এমন নক্ষত্রের সংখ্যা নেমে এসেছিলে ০.০০১% -এ। ২০০ টটি প্যারামিটারের জন্য হিসেবটা কী হবে? এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখতে পারেন,

Rees, Martin. Just six numbers: The deep forces that shape the universe, ২০০৮; Adams, Fred C. "The degree of fine-tuning in our universe—and others." ২০১৯; এবং Barnes, Luke A. "The fine-tuning of the universe for life." Routledge, 2021।

কাজেই এই মহাবিশ্বের কোনো একটি গ্রহে প্রাণের বিকাশের জন্য (জটিল ও বুদ্ধিমান প্রাণের কথা বাদই দিলাম) বিস্ময়কর ধরনের সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটের প্রয়োজন। কাকতালীয়ভাবে সঠিক ধারাবাহিকতায় একের পর এক সুনির্দিষ্ট দুর্ঘটনার মাধ্যমে দৈবক্রমে এই সুনির্দিষ্ট ফলাফল এসেছে। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের এটা বিশ্বাস করতে ভালো রকমের কষ্ট করতে হবে। (অনুবাদক)

[3] মুহাম্মাদ আসাদ, Islam at the Crossroads (১৯৫৫), আশরাফ পাবলিকেশনস, লাহোর, পৃ. ১৭-২০। ('সংঘাতের মুখে ইসলাম' নামে বাংলায় অনূদিত। ~অনুবাদক)